সমগ্র বিশ্বে সাড়াজাগানো গ্রন্থ
আস-সুন্নাহ ওয়ামাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি-এর অনুবাদ

সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ
(১৩৩৪–১৩৮৪ হিজরি)
(১৯১৫–১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

আহমাদ রিফআত
দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,
সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
সম্পাদক : ipaedia.org

সম্পাদনা

শাব্বীর মুহাম্মদ
লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১৩
মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ১৭
নবি ও রাসুল ১৭
মুজিজার পরিচয় ১৮
নবির প্রতি ওহি আগমনের পদ্ধতি ১৮
হাদিস অস্বীকারের সূচনা ২৯
হাদিসের নামে বর্ণনা জাল করা যেভাবে শুরু হলো ৩০
হাদিসের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের শত্রুতা ৩২
হাদিস সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ৩৪
বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৩৭
অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ৩৮

প্রাক্কথন ৪০
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৪০
লেখকের কথা ৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৪৫
গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা ৪৬
আবু রাইয়ার গ্রন্থের পর্যালোচনা ৪৬
প্রথম পর্যালোচনা : ইসলামি আইনে সুন্নাহর মর্যাদা ৪৬
ইসলামি আইন বিন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া ৪৭
যুগে যুগে সুন্নাহর বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণ ৪৭
দ্বিতীয় পর্যালোচনা : ‘মিথ্যা’ গবেষণার বেড়াজাল ৪৮
জালে আটকে যাওয়ার কি কারণ? ৪৮
তৃতীয় পর্যালোচনা : আবু রাইয়ার বইয়ের প্রকৃত বাস্তবতা ৪৯
‘নির্ভরযোগ্য’ গ্রন্থাদির উদ্ধৃতির স্বরূপ ও বাস্তবতা ৫০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরও তাঁর আনুগত্য আবশ্যক ১৩১
যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম সুন্নাহ শিখেছেন..১৩৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সুন্নাহ কেন সংকলিত হয়নি?
নবিযুগে কি সুন্নাহর কোনো অংশ লেখা হয়েছিল? ১৩৮
খোলাসা কথা.. ১৪২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হাদিস গ্রহণ ও সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপ ও নীতিমালা ১৪৩
অধিক হাদিস বর্ণনা করায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কোনো সাহাবিকে আটক করেছিলেন? ১৪৯
আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৫০
সাহাবিগণ কি কোনো সাহাবির হাদিস গ্রহণের জন্য শর্তারোপ করতেন? .. ১৫৪
দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা... ১৬১
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গ.. ১৬১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু...১৬৪
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু.. ১৬৭
হাদিস অন্বেষণে সাহাবিগণের দূরদূরান্তের বিভিন্ন শহরে সফর ১৬৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক হাদিস বর্ণনাকারী কয়েকজন সাহাবি..১৭০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৭২
জাল হাদিসের সূচনা ও প্রেক্ষাপট ১৭২
কখন থেকে হাদিস জাল করা শুরু হলো? ১৭২
কারা জাল হাদিস রচনা শুরু করল? ১৭৩
যে প্রেক্ষাপটগুলোতে জাল হাদিস তৈরি হয়েছে.............................. ১৭৯
খারেজিরা কি মিথ্যা হাদিস প্রচার করত? ১৮৬
খারেজিরা হাদিস জাল করত—এই দাবির পক্ষে পেশকৃত দুটি দলিল..১৮৭
মিথ্যা হাদিস রচনাকারীদের শ্রেণিবিন্যাস...২০২

শিয়া ও খারেজিদের মধ্যকার পার্থক্য ২৮০
সারকথা.. ২৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৮২
সুন্নাহ সম্পর্কে মুতাজিলা ও মুতাকাল্লিমিন (কালামশাস্ত্রবিদ)-দের দৃষ্টিভঙ্গি ২৮২
ওয়াসিল ইবনু আতা (মৃত্যু: ১৩১ হিজরি) ২৮৫
আমর ইবনু উবায়দ ২৮৭
আবুল হুজায়ল (মৃত্যু: ২২৭/২৩৫ হি.) ২৮৮
আন-নাজ্জাম ২৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ...৩০০
নিকট অতীতে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩০০
ইমাম শাফেয়ি ও মুনকিরে হাদিসের বিতর্ক.....................................৩০০
দীর্ঘ বিতর্কের মূলকথা ৩১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ... ৩২২
বর্তমান সময়ে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি................ ৩২২
সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দলিল ও সন্দেহসমূহ............. ৩২২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩৫২
‘খবরে ওয়াহেদ’ বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসের প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি...৩৫২
খবরে ওয়াহেদকে শরিয়তের হুজ্জত অস্বীকারকারীদের সন্দেহ........ ৩৫৪
এসব সন্দেহের জবাব... ৩৫৬
খবরে ওয়াহেদ শরিয়তের হুজ্জত হওয়ার দলিলসমূহ ৩৬৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ..৪০১
সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের তৈরি করা সংশয়-সন্দেহ ৪০১

প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণের উদ্দেশ্য..৪০১
ড. গোল্ডজিহার (Goldziher) ও সুন্নাহ সম্পর্কে তার চিন্তাধারার মূল ভাষ্য এবং সহিহ হাদিস নির্ধারণে সন্দেহ রোপণের প্রয়াস ৪০৫
শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কেও হাদিস রচনা করা হতো..................... ৪১১
গোল্ডজিহারের সংশয় ও তার নিরসন এবং প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা ও সন্দেহের জবাব ৪১৬
হাদিস কি মুসলমানদের চিন্তার উৎকর্ষের ফসল? ৪১৭
১. ইসলামে উমাইয়াদের অবস্থান..৪২০
২. মদিনার আলিমগণ কি হাদিস জাল করতেন?........................ ৪২৪
৩. দীন রক্ষার জন্য আমাদের আলিম সমাজ কি মিথ্যাচার বৈধ করেছেন? ৪২৭
৪. হাদিসে মিথ্যার অনুপ্রবেশ প্রথম কীভাবে হলো?.................... ৪২৯
৫. হাদিস জালকরণে উমাইয়া সরকারের হাত ছিল কি?................৪৩১
৬. হাদিসের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণসমূহ..............................৪৩২
৭. জাল-হাদিসে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ছিল (?) ৪৩৪
৮. উমাইয়ারা কি ইমাম জুহরিকে হাদিস জালকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে?.. ৪৩৬
ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ ও ইতিহাসে তার স্থান ৪৩৭
ইমাম জুহরির নাম, বংশ, জন্ম-মৃত্যু ও সংক্ষিপ্ত জীবনী..................... ৪৩৮
শিক্ষাজীবন ৪৩৮
ইমাম জুহরির আকৃতি, অনুপম চরিত্র ও গুণাবলি.......................৪৩৯
জুহরির স্মৃতিশক্তির অবিস্মরণীয় ঘটনা.. ৪৪২
ইলমে হাদিসে ইমাম জুহরির সুখ্যাতি ও জনসাধারণ্যে এর ব্যাপক স্বীকৃতি ৪৪৩
ইলমে হাদিসে ইমাম জুহরির বিস্তৃতির ওপর তাঁর সমকালীন আলিমদের প্রশংসা...৪৪৩
সুন্নাহ-য় ইমাম জুহরির মর্যাদা ৪৪৪
হাদিস ও সুন্নাহর ময়দানে ইমাম জুহরির কৃতিত্ব ৪৪৬

সম্পাদকের কথা

ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টানরা তাদের সমর-কৌশল পরিবর্তন করে। প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে মুসলমানদের বিপক্ষে চালানো ক্রুসেড যুদ্ধে বারবার পরাজয়ের পর খ্রিষ্টান-দুনিয়ায় নতুন ভাবনার উদয় হয়। তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হয়। মুসলমানদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদিস ও আরবি ভাষা-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এ কাজের জন্য তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রাচ্যবিদ' নামে একদল পণ্ডিত গড়ে তোলে। কালক্রমে সেই ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ প্রাচ্য দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশেষ করে ইসলামি জ্ঞান ও শাস্ত্রের নানা শাখার গবেষণা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাদের জ্ঞান-সাধনার স্বীকৃতির সঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত সত্য যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই ইসলামি দীন-শরিয়ত, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুনের দুর্বলতার সন্ধানেই তাদের সমুদয় মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তারা তাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মূলত তাদের অনেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকেই এ কাজে যুক্ত হয়ে সমগ্র মেধা ও শ্রম দিয়ে আজীবন মিশনারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে গেছেন।

তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে পৃথিবীখ্যাত ইসলামিক স্কলার সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—'অনেক প্রাচ্যবিদকে আমরা দেখেছি, তারা তাদের যাবতীয় প্রয়াস ও সাধনাকে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সমাজ এবং ইসলামি সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধানে ব্যয় করেন। এরপর নাটকীয় ভঙ্গিতে তা পাঠকদের সামনে পেশ করেন। তারা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে সামান্য ধূলিকণাকে পাহাড় আর বিন্দুকে সিন্ধু বানিয়ে উপস্থাপন করেন। মেধার প্রখরতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের প্রকৃত চেহারাকে বিকৃত করার কাজে নিয়োগ করেন।' [আল-ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুসতাশরিকিন ওয়াল বাহিছিনাল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা: ১৫-১৬, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, মুদ্রণ: ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ঈ.]

উপকারিতা কমেনি। বরং সময়ের পথপরিক্রমায় সংশয়বাদী প্রাচ্যবিদদের হিংস্র থাবায় এর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। সেই প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর কত লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আরববিশ্ব থেকে শুরু করে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। ইংরেজি, উর্দু থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে সমাদৃত এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক গবেষক আহমাদ রিফআত। ইতোমধ্যে তার কয়েকটি বই সাড়া জাগিয়েছে। অধম সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদ যথাসাধ্য সম্পাদনা করেছি। যেসব অসঙ্গতি নজরে এসেছে শুধরে দিয়েছি। সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করে গ্রন্থের ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, অনুবাদে মূল গ্রন্থের টীকার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ নতুন টীকাও যুক্ত করা হয়েছে। এতে অনূদিত সংস্করণের উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব টীকা বর্তমান সংস্করণটিকে একটি ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ সংস্করণে পরিণত করেছে। আমার বিশ্বাস—মাদরাসা, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ গ্রন্থটি থেকে বিপুল উপকৃত হবেন। বিশেষ করে যারা গবেষণা করেন এবং প্রাচ্যবিদদের রচনা অধ্যয়ন করেন তাদের জন্য গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। যুগোপযোগী এমন গ্রন্থ উপহার দেয়ায় পথিক প্রকাশন পাঠকদের আন্তরিক দুআ পাবেন—ইনশাআল্লাহ।

কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে জানানোর বিনীত অনুরোধ থাকল। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করেন। সকলের কাজকে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমিন!

বিনীত

শাব্বীর মুহাম্মদ

০২/০৭/১৪৪৫ হি.

১৪/০১/২০২৪ ঈ.

shabbir9720@gmail.com

'আমি তো কেবল আমার প্রতি যে ওহি অবতীর্ণ করা হয় তা-ই অনুসরণ করি।'[২]

অপরদিকে মানবজাতির জন্য এই মহান মানুষদের আনুগত্য করা আবশ্যক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

'আমি প্রত্যেক রাসুলকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে।'[৩]

মুজিজার পরিচয়

নবি-রাসুলগণকে যেসব অকাট্য দলিল ও নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, ইসলামি পরিভাষায় সেগুলোকে 'মুজিজা' (এমন প্রমাণ যা মানুষ রদ করতে কিংবা অনুরূপ সৃষ্টি করতে অক্ষম) ও 'আয়াতে বায়্যিনাত' (সুস্পষ্ট নিদর্শন) বলা হয়। 'মুজিজা' এই কথার প্রমাণ যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিজীবকে পথ দেখাতে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নবিগণ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। 'মুজিজা'র উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির কাছে নবুওতের সত্যতা সুসাব্যস্ত করে দেওয়া, যেন এর বিপরীতে কোনো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার সুযোগ না থাকে, মানুষ একনিষ্ঠ মনে নবিগণকে সত্যায়ন করতে পারে, তাঁদের ওপর ইমান আনতে পারে।

রবের সকল আদেশ-নিষেধ এবং যাবতীয় ঐশী পথনির্দেশনার ভিত্তি আসলে রবের সাথে ওই 'সংযোগ ও সম্পর্ক', যা নবিগণ সরাসরি লাভ করেন, আর সকল সৃষ্টিজীবের লাভ হয় নবি-রাসুলগণের মধ্যস্থতায়। নবি-রাসুলগণ সরাসরি আল্লাহর পয়গাম ও বিধান লাভ করতেন এবং সৃষ্টিজীবের কাছে পৌঁছাতেন।

নবির প্রতি ওহি আগমনের পদ্ধতি

আল্লাহ কখনো সরাসরি নবির অন্তরে স্বীয় পয়গাম ঢেলে দিতেন (النفث في الروع أو الإلقاء في القلب), কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁদের নিকট পয়গাম পৌঁছাতেন। যে ফেরেশতাকে পয়গাম পৌঁছানোর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তার নাম 'জিবরাইল'। কুরআনে এসেছে,

---

[২] সুরা আল-আহকাফ (৪৬) : ৯।

[৩] সুরা আন-নিসা (০৪) : ৬৪।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

'কোনো মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সামনাসামনি) কথা বলবেন, তবে ওহির মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা পর্দার আড়াল থেকে কিংবা আল্লাহ (তার নিকট) কোনো বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান (সেই ওহির বার্তা) পৌঁছে দেবে।'[৪]

বার্তাবাহী ফেরেশতা ওহির পয়গাম নিয়ে আসার যে কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে, তা আসমানি সহিফা বা আসমানি কিতাবের অংশ হওয়া জরুরি নয়। বরং কখনো ওহির পয়গাম ফেরেশতা নিজ ভাষায় পৌঁছে দেন, কখনো আল্লাহ তাআলা নবির হৃদয়ে তা ঢেলে দেন।

ওহির যেসব পয়গাম আল্লাহর তরফ থেকেই শব্দাকারে সাজিয়ে ফেরেশতার মাধ্যমে রাসুলগণের নিকট পৌঁছানো হয়েছে, ইসলামি পরিভাষায় এসব পয়গামকে 'ওহিয়ে মাতলু'[৫], 'কালামুল্লাহ' (আল্লাহর কথা), 'কিতাবুল্লাহ' (আল্লাহর কিতাব) ও 'সহিফা' (পুস্তিকা) বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের ওহির পয়গাম আল্লাহর তরফ থেকে শব্দাকারে সাজিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহ যেন পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্ম সিনায় সংরক্ষণ করতে পারে। আর যেসব পয়গাম ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত কিংবা ফেরেশতা নিজ ভাষায় পৌঁছে দেন, সেগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় 'ওহিয়ে গাইরে মাতলু'[৬] বলা হয়।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ সহিফাসমূহ এবং চারজন 'উলুল আজ্‌ম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবির ওপর অবতীর্ণ চার কিতাব তথা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন 'ওহিয়ে মাতলু'র উদাহরণ।

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন, নবি ও রাসুলগণের সংখ্যা লাখেরও অধিক[৭], সেই তুলনায় সহিফা ও কিতাবের সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই কম। আবার এটাও নিশ্চিত

[৪] সুরা আশ-শুরা (৪২) : ৫১।

[৫] যে ওহি সালাতে তিলাওয়াত করা হয় এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত গণ্য হয় তথা কুরআনের ওহি।

[৬] যে ওহি সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না এবং যার তিলাওয়াত সরাসরি ইবাদত গণ্য হয় না তথা সুন্নাহর ওহি।

[৭] মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় এসেছে, নবিগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। কিন্তু বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে নবি-রাসুলগণের সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। দেখুন, 'এসব হাদিস নয়', মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ ২/৩৫-৩৬।

আর এই বাস্তবতাও সর্বজনস্বীকৃত, মানবজাতির জন্য আল্লাহর নির্দেশনা ও বিধানাবলি যেমন কুরআনের অংশরূপে নবিজির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর বহু বার্তা ও বিধান নবিজির ওপর কুরআন ভিন্ন ওহির মাধ্যমেও অবতীর্ণ হয়েছে, উম্মতকে তা জানানো হয়েছে এবং নবিযুগে আল্লাহর বিধানরূপে তার ওপর আমলও করানো হয়েছে। কুরআনের ভাষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রদত্ত আসমানি শিক্ষার নাম হচ্ছে 'আল-হিকমাহ'। এই জন্য কুরআন কয়েক জায়গায় 'আল-হিকমাহ'র জন্যও أَنْزَلَ (আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই মৌলিক বাস্তবতাগুলো বুঝলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সহজ হয়, দীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা। দীনের উৎসমূল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় শিক্ষা ও পথনির্দেশ এবং তাঁর সমুদয় বাণী ও কর্মসমষ্টি; চাই কুরআনে তা উল্লেখিত হোক বা না হোক।

ইসলামি শরিয়াহর রূপরেখা নিয়ে গভীর চিন্তা করলে জানা যায়, শরিয়তের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিধান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বাস্তবায়ন করতেন। আর এ বিষয়ও স্পষ্ট যে, এসব বিধান তিনি আল্লাহপ্রদত্ত কুরআন ভিন্ন ওহির মাধ্যমে জেনেই বাস্তবায়ন করতেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত কুরআনে সেগুলোর উল্লেখ থাকত না, পরবর্তীকালে কুরআনে সেসব বিধান সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হতো। যেন কুরআন নবিজির জারি করা বিধানগুলোর সত্যায়ন করত। নিম্নোক্ত কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বাস্তবতা অনেক স্পষ্ট হয়।

১. তাওহিদের বিশ্বাসের পর সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এই ইবাদত পালনের ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিরাজের ঘটনার আগে সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত সালাত পড়া হতো। মিরাজের পর সালাত পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত কুরআনে না সালাতের ওয়াক্ত-সংখ্যার কথা উল্লেখ ছিল, না সালাত আদায় করার পদ্ধতি ও কাঠামোর বিবরণ ছিল। উম্মাহ এই ফরজ বিধানকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও প্রায়োগিক নির্দেশনার অধীনেই গ্রহণ করেছে এবং (কুরআনে এই বিবরণ উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও) আমল শুরু করে দিয়েছে।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

'তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায়

সংরক্ষণ করেছেন, যা দেখে ইসলাম-বিরোধীরাও হতবাক হয়ে যায়।

হাদিসের নামে বর্ণনা জাল করা যেভাবে শুরু হলো

হাদিসে নববি ও পবিত্র সুন্নাহর প্রতি মুসলিম উম্মাহর আছে গভীর আগ্রহ, অনিঃশেষ মুগ্ধতা ও ভালোবাসা। তা দেখে শত্রুরা ইসলামের এই মহামূল্যবান সম্পদ অকেজো করে দেওয়ার আরেকটি ধূর্ত পথ অবলম্বন করে; তারা নিজেদের তৈরি করা নানা বর্ণনাকে সহিহ হাদিস ও বর্ণনার সঙ্গে মিশিয়ে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর বিভিন্ন সময় তারা এটাও ঘোষণা করেছে, 'আমরা এত হাজার জাল হাদিস সহিহ হাদিসের সাথে মিলিয়ে প্রচার করে দিয়েছি, সেগুলো এখন মুহাদ্দিসদের হাদিসের ক্লাসে চর্চা করা হচ্ছে।' তাদের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির মতলব ছিল, বিশুদ্ধ ও বাতিল বর্ণনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে গোটা হাদিস-ভান্ডারের ওপর থেকে মুসলমানদের আস্থা ও নির্ভরতা উঠে যাবে এবং দীন ইসলামের এই সুদৃঢ় ইমারত জমিনে ধসে পড়বে!

কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় দীন ও সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে সংরক্ষণ করা ও স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য এমন কর্মবীর মনীষী সৃষ্টি করে দিলেন, যারা হাদিসের বর্ণনা যাচাই এবং বিশুদ্ধ ও বাতিল বর্ণনা আলাদা করার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অনেক শাস্ত্র সংকলন করেছেন, যেসব শাস্ত্রের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি। পাশাপাশি হাদিস বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই এবং বর্ণনাকারীদের কে নির্ভরযোগ্য আর কে অনির্ভরযোগ্য তা আলাদা করার লক্ষ্যে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র সংকলন করেছেন। এই শাস্ত্রের লিটারেচারে তারা হাদিস বর্ণনাকারীদের কে 'সিকাহ' (বিশ্বস্ত), কে 'জয়িফ' (দুর্বল), কে 'কাজ্জাব' (মিথ্যুক) ও 'ওয়াদ্দা' (হাদিসের জাল বর্ণনা তৈরিকারী) ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এভাবে তারা দুধ আর পানি আলাদা করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের এসব শাস্ত্র চর্চার ফলে শত্রুদের শেষ চেষ্টা (পড়ুন ষড়যন্ত্র) ব্যর্থ হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে বিশুদ্ধ হাদিস সংরক্ষিত হওয়ার সহায়ক শাস্ত্রগুলোও অস্তিত্বে আসে।

নিঃসন্দেহে ইসলাম চিরস্থায়ী ধর্ম। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পথের উৎস। তাই আবশ্যক ছিল, ইসলামের দুই মশাল–'কিতাব ও সুন্নাহ' (অন্যভাবে বললে 'কুরআন ও হাদিস') আলোকিত থাকবে; সব ধরনের তুফান, অন্ধকার ও সংকট থেকে সংরক্ষিত থাকবে; যাতে আল্লাহপ্রদত্ত প্রমাণ মানবজাতির সামনে সদা স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান এবং আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে। কুরআনের এই আয়াত আদম-সন্তানের কানে প্রতিধ্বনি তোলে, অন্তরে

প্রাক্‌কথন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين، وأناط تفصيل أحكامه بخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وصحبِه نقلةِ الوحي والأمناءِ على الحق والدعاةِ إلى الله على هدى وصراط مستقيم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

আমরা এমন একটি সময় পার করছি, যখন গোটা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত চলমান, যে মতাদর্শগুলো বিশ্বমানবতার শান্তি ও কল্যাণ অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা যতই বলি, আজকের এই সংঘাত মূলত প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর নেতাদের হাজারটা অপকর্মের ফল। কিন্তু সন্দেহ নেই, পৃথিবীর এই অধঃপতনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সেসকল মতাদর্শই দায়ী, যা আজও মানবতার মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত প্রমাণিত হয়নি। মানবতাকে যুদ্ধবিগ্রহ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পৃথিবীজুড়ে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে তা দূর করতে পারেনি। আর যুদ্ধকালীন সময়ে তো হত্যাযজ্ঞ, ক্ষয় ও ধ্বংসলীলার এক নিকষ আবর্তে ঢাকা ছিল গোটা পৃথিবী।[২৮]

আমরা মুসলমান। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণপিয়াসি হলে আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষার দিকেই ফিরে আসতে হবে; যা দিনের আলোর ন্যায়

[২৮] লেখক এই ভূমিকা লিখেছেন ১৯৪৯ সালে। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পঞ্চম বছর। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন, ক্যাপিটালিজম কিংবা কমিউনিজম কোনো মতবাদই যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি। ডেমোক্রেসির মতো রাজনৈতিক মতাদর্শ পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কখনোই সক্ষম হয়নি।

মাঝে অস্থিরতা তৈরি করা এবং ইসলামি শরিয়তের এই মজবুত ভিতকে ধ্বংস করে দেওয়া।

কিন্তু আফসোস! আমাদের কিছু অদূরদর্শী লেখকও প্রাচ্যবিদদের অনুসরণ করেছেন। তারা মূলত প্রাচ্যবিদদের নানা চাকচিক্যময় গবেষণার ফাঁদে আটকা পড়েছেন, যেগুলো নিরপেক্ষ বাস্তবধর্মী পর্যালোচনার সামনে ধোপে টেকে না। কিংবা তারা প্রবৃত্তির চাহিদা ও চিন্তাগত সংশয়ের জালে আটকা পড়েছেন। সালাফে সালেহিন রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ এবং আস্থাভাজন আলিমদের সুচিন্তিত গবেষণার কষ্টিপাথরে এসব সংশয় তারা যাচাই করে দেখেননি। ফলে সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের জঘন্য চিন্তা তাদের শূন্য হৃদয়ে সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। তারা প্রাচ্যবিদদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন। তাদের অবস্থা সেই আরব কবির মতোই, যিনি বলেছেন,

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا.

‘প্রিয়ার ভালোবাসা এলো আমার কাছে এমন সময়ে, যখন আমি ভালোবাসা কী তা জানতাম না; ফলে প্রিয়ার ভালোবাসা আমার শূন্য হৃদয়ে বাসা বেঁধে নিল।’[২৯]

এই মানসিকতার লেখকদের মন-মগজ প্রাচ্যবিদদের ধারণাপ্রসূত গবেষণা ও বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আটকা থাকে। ১৩৫৮ হিজরির কথা, এমন একজন লেখকের সাথে আমার কথাবার্তা হয়। তাদের সেইসব অবাস্তব ধারণা ও বিভ্রান্তির খণ্ডনমূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে কিছুটা বেগ পোহাতে হয়েছিল। মূলত তখনই আমি ‘ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর মর্যাদা’ বিষয়ে বই লেখার সিদ্ধান্ত নিই। যুগে যুগে সুন্নাহ যেসব ঐতিহাসিক পর্ব পার করে এসেছে এবং সুন্নাহকে রক্ষায় প্রতিযুগে ইসলামের ইমামগণ যে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা নিয়ে বইটিতে আলোচনা করেছি। অতীত ও বর্তমানে সুন্নাহর ওপর হামলাকারীদের শান্তভঙ্গিতে ইলমি ভাষায় জবাব দিয়েছি, যাতে সত্য স্পষ্ট হয়, পবিত্র সুন্নাহর স্বরূপ সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়।

বইয়ের শেষদিকে মুজতাহিদ ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছি, যারা ছিলেন ইসলামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আলেম। কারণ, সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণের সমুজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। সুন্নাহর ওপর নির্ভর করে শরয়ি বিধান বর্ণনা ও উদ্‌ঘাটনে ফকিহগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

বইটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি এবং একটি পরিশিষ্ট যোগ করেছি।

---

[২৯] আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন, জাহিয: ২/২৯।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও বিশদ বিবরণ ও কিছু কিছু সংযোজন করার অপেক্ষায় তা ছাপতে গড়িমসি করছিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা

আমার এই গড়িমসির সময়ের মধ্যেই আবু রাইয়ার *আদওয়া আলাস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তার এই গ্রন্থে সুন্নাহ ও সুন্নাহর বর্ণনাকারীদের নিয়ে জ্ঞানগত মানদন্ডে অনুত্তীর্ণ যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা সবারই জানা আছে। তখন আমাদের বন্ধুরা আমার লেখা প্রবন্ধের আলোচনাগুলোর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন এবং আমাকে তা প্রকাশ করতে বাধ্য করেন। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে যেভাবে এই প্রবন্ধ লেখা ছিল সেভাবেই এখন উল্লেখ করছি। তবে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সংশ্লিষ্ট আলোচনাটি এখানে সংযোজন করেছি। এই সংযোজন মূলত আবু রাইয়া হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর যে আপত্তি করেছে, তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী, সুস্থতা যদি আমার সঙ্গ দান করে, তাহলে আমার আশাও পূর্ণ হয়ে যাবে। আমার লিখিত গ্রন্থটিকে যেরূপ পেতে চাই, তেমন পাওয়ার সৌভাগ্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

আবু রাইয়ার গ্রন্থের পর্যালোচনা

এখানে আমি আবু রাইয়ার গ্রন্থের ওপর কিছু পর্যালোচনা করা আবশ্যক মনে করছি।

প্রথম পর্যালোচনা : ইসলামি আইনে সুন্নাহর মর্যাদা

ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর গুরুত্ব এবং ফিকহে ইসলামিতে সুন্নাহর প্রভাব নবিযুগ ও সাহাবাযুগ থেকে মুজতাহিদ ইমামদের যুগ ও ইজতিহাদি মাজহাব স্থির হওয়া পর্যন্ত এমন অবস্থানে আছে, যা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। সুন্নাহ ফিকহে ইসলামির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হওয়ার ফলে তা এমন আইনী সম্পদে পরিণত হয়েছে—অতীত ও বর্তমান কোনো জাতির আইনের ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যিনি কুরআন-সুন্নাহ তুলনামূলক অধ্যয়ন করবেন, তিনি জানতে পারবেন, ইসলামি শরিয়তের ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতার রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং শরিয়তের মহত্ত্ব ও অমরত্বে সুন্নাহর অবদান সবচেয়ে বেশি। ফিকহ ও ফিকহি মাজহাব সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তিই এই স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না। মূলত ইসলামি শরিয়ত সেই সুমহান আইন, যার সামগ্রিকতা ও

কোনো সন্দেহ নেই, ইসলাম ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে যে লড়াই চলমান, তা পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও দুশমনদের পরাস্ত করে ছাড়বে এবং তাদের অন্তরের লুকিয়ে থাকা অসদুদ্দেশ্য অচিরেই প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর ইসলাম এমন এক উচ্চ পাহাড়ের মতো স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে, যার ওপর দিয়ে বালুর তুফান ও লু হাওয়া উড়ে একাকার হয়ে যায়। কারণ, ইসলাম ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যকার লড়াই মূলত সত্য ও প্রবৃত্তির সংঘাত, ইলম ও মূর্খতার সংঘাত, বদান্যতা ও হিংসার সংঘাত, আলো ও অন্ধকারের সংঘাত। আর জীবনে এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান হলো—সত্য, ইলম, বদান্যতা ও আলো সব সময় বিজয়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ.

'বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করে যায়।'[৩১]

দ্বিতীয় পর্যালোচনা : 'মিথ্যা' গবেষণার বেড়াজাল

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষীদের পথে হাঁটছে একদল আলেম ও লেখক। তারা মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করি না, তবে তারা প্রাচ্যবিদ এবং পশ্চিমা গবেষক ঐতিহাসিকদের 'মিথ্যা' গবেষণা ও (বাহ্যিক) জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত—যার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তারা গোপন রাখে। ফলে আমাদের কিছু লেখক মুসলিম হয়েও জেনে বা না-জেনে তা-ই করতে উদ্যত, যার জন্য ওই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাম্রাজ্যবাদীরা অবিরাম চেষ্টা-সাধনা করে চলছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি, মন্দ ধারণা ও খেয়ানত করা-সহ অন্যান্য প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে। আর এভাবেই তারা ইসলামের দুশমনদের সাথে একই প্লাটফর্মে মিলিত হয়; যাদের না জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমি-তাহকিকি ময়দানে কোনো মূল্য আছে, আর না ইতিহাসের দিক থেকে তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে।

জালে আটকে যাওয়ার কি কারণ?

এই বাস্তবতাও সামনে রাখা উচিত যে, মুসলিম লেখকদের মধ্য থেকে যারা প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিক ও ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা লেখকদের ফাঁদে পা দেয়, তারা নিম্নোক্ত চারটির কোনো এক কারণে তাদের দ্বারা ধোঁকা খায়:

[৩১] সুরা আল-আম্বিয়া (২১) :১৮।

উক্তিমূলক সুন্নাহর উদাহরণ হলো বিধান-সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন সময়ের উক্তি, যেমন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

‘নিশ্চয়ই আমলের ফলাফল নির্ভর করে মানুষের উদ্দেশ্যের ওপর।’[৫৫]

উক্তিমূলক সুন্নাহর আরেকটি উদাহরণ,

البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

‘ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত লেনদেন বাতিল করার কিংবা বহাল রাখার অধিকার উভয়েরই আছে।’[৫৬]

কর্মগত সুন্নাহর উদাহরণ হলো ইবাদত ও অন্যান্য বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব কর্ম সাহাবিগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন—সালাত আদায়, হজের পদ্ধতি, সিয়ামের আদবসমূহ, সাক্ষী ও হলফ দ্বারা বিচারকার্য সম্পন্ন করা ইত্যাদি।

সাহাবিদের কোনো কাজের স্বীকৃতিগত সুন্নাহ দুই ধরনের:

১. সাহাবিগণের যেসকল কাজ নবিজির সামনে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি সে ব্যাপারে নীরব ছিলেন এবং বুঝা গেছে, তিনি এতে সন্তুষ্ট বলেই নীরব ছিলেন।

২. বা সে কাজটি তিনি ভালো বলেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বনু কুরায়জার ঘটনা। সে ঘটনায় আসরের সালাত-সংক্রান্ত নবিজির নির্দেশনা অনুধাবনে সাহাবিগণের মতপার্থক্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহাল রেখেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে বলেছিলেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدَكُمْ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

‘বনু কুরায়জায় না পৌঁছে তোমরা কেউ আসরের সালাত পড়বে না।’[৫৭]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ এ নিষেধাজ্ঞা বাহ্যিক মর্মে গ্রহণ করলেন। তাঁরা বনু কুরায়জায় পৌঁছে আসরের সালাত কাজা পড়লেন মাগরিবের পর। আবার তাদের কেউ কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আদেশের এ মর্ম গ্রহণ

[৫৫] সহিহ বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭।
[৫৬] সহিহ বুখারি : ২০৭৯; সহিহ মুসলিম : ১৫৩২।
[৫৭] সহিহ বুখারি : ৯৪৬; সহিহ মুসলিম : ১৭৭০।

সুন্নাহর তৃতীয় অর্থ

ফকিহগণের পরিভাষায় 'সুন্নাহ' হচ্ছে, যা ফরজও নয়, ওয়াজিবও নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত শরয়ি হুকুমের পাঁচটি স্তরের[৬০] একটি স্তর। ফকিহগণ কখনো 'সুন্নাহ' শব্দটি 'বিদআত'-এর বিপরীতেও ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বলা হয়,

طَلَاقُ السُنَّةِ كَذَا، وَطَلَاقُ البِدْعَةِ كَذَا.

'সুন্নাহসম্মত তালাক এরূপ, আর বিদআতি তালাক এরূপ।'[৬১]

'সুন্নাহ' শব্দের এই পারিভাষিক ভিন্নতার মূল কারণ হলো, প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ নিজ নিজ শাস্ত্রে যে দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহর আলোচনা করে থাকেন, সেই বিবেচনায় সুন্নাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সেই পথপ্রদর্শক, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ ও উত্তম নমুনা—মুহাদ্দিসগণ সুন্নাহ চর্চা করেছেন এই দিক বিবেচনায়। ফলে তাঁর কথা, কাজ, গুণাবলি, দৈহিক গঠন—মোটকথা নবিজির সাথে সম্পৃক্ত যা কিছুই পেয়েছেন সবই আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাগুলো দ্বারা কোনো শরয়ি বিধান সাব্যস্ত হলো কি না, এটি তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল না।

উসুলের আলিমগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন একজন শরিয়তপ্রবর্তক হিসেবে। যিনি পরবর্তী মুজতাহিদগণের জন্য মূলনীতি স্থির করেছেন এবং মানবজাতির জন্য জীবন-সংবিধান বয়ান করেছেন। তাই উসুলবিদ আলিমগণের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল রাসুলের সেই উক্তি, কর্ম ও স্বীকৃতিমূলক সুন্নাহ চর্চা করা, যার মাধ্যমে শরয়ি বিধান সাব্যস্ত হয়।

অন্যদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কাজই কোনো-না-কোনো শরয়ি বিধান প্রমাণ করে। ফকিহগণের লক্ষ্য ছিল বান্দার বিভিন্ন কর্ম সম্পর্কে শরয়ি বিধানের স্তর বিন্যাস করা—অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত কর্ম কি ওয়াজিব, না হারাম, না মুবাহ, না অন্য কিছু।

উসুলবিদ আলিমগণের পরিভাষার 'সুন্নাহ'-কে নিয়েই আমাদের এই গ্রন্থের আলোচনা সীমাবদ্ধ। কেননা তাদের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী সুন্নাহর যে মর্ম দাঁড়ায়, সেই সুন্নাহর প্রামাণ্যতা এবং শরিয়ত প্রণয়নে এর কী মর্যাদা সেটিই সাধারণত

[৬০] করণীয় হিসেবে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ; বর্জনীয় হিসেবে হারাম এবং মাকরুহ।
[৬১] ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানি, পৃষ্ঠা: ৩১।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তিনি নিশ্চিতভাবে 'হিকমত' অর্থ 'সুন্নাহ' গ্রহণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ হিকমত উল্লেখ করছেন কিতাবের সঙ্গে। যাতে প্রমাণিত হয়, উভয়টি এক বস্তু নয়, বরং পৃথক পৃথক। আর 'হিকমত'-এর মর্ম 'সুন্নাহ' ছাড়া অপর কিছু গ্রহণ করা সঠিক নয়। কেননা আমাদেরকে হিকমত শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ নিজের বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর যা সত্য ও সঠিক, তা ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ অনুগ্রহ হতে পারে না। কাজেই কুরআনের মতোই 'হিকমত' অনুসরণ করা ফরজ। তা ছাড়া, এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ, আমাদের ওপর কুরআন ও রাসুলের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই ফরজ করা হয়নি। সুতরাং এটা সুসাব্যস্ত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশিত উক্তি ও শরিয়তের বিধানসমষ্টিই হলো 'হিকমত'।

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন দেওয়া হয়েছে; সেই সাথে দেওয়া হয়েছে এমন আরও কিছু যা অনুসরণ করা ওয়াজিব। কুরআন ছাড়া এই অন্য বিষয়টির কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন—

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

'তিনি তাদের নেক কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করে দেন। আর তিনি তাদের মুক্ত করেন গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের ওপর পূর্বে ছিল।'[৬৭]

আয়াতটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব বর্ণনা করেছে। আয়াতের শব্দগুলো ব্যাপকার্থজ্ঞাপক। 'যা তিনি হালাল করেন ও হারাম করেন' —চাই তার উৎস কুরআন অথবা কুরআন ভিন্ন এমন ওহি যা আল্লাহ তাঁর কাছে পাঠান। এ কথার প্রমাণ মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস,

أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

'জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমাকে প্রদান করা হয়েছে কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ ভিন্ন ওহি।'[৬৮]

[৬৭] সুরা আল-আরাফ (০৭) : ১৫৭।
[৬৮] সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৪।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা একান্তই আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার আনুগত্য করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।'[৭৩]

আল্লাহ তাআলা রাসুলের আদেশের বিরোধিতার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

'সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত; তাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে অথবা তাদের ওপর এসে পড়বে কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৭৪]

এমনকি আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করা কুফরি কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

'আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো, তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।'[৭৫]

আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে রাসুলের আদেশ ও ফয়সালাকে অমান্য করার সামান্যতম অধিকার কাউকে দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। আর কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।'[৭৬]

[৭৩] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ৩১।
[৭৪] সুরা আন-নুর (২৪) : ৬৩।
[৭৫] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ৩২।
[৭৬] সুরা আল-আহজাব (৩৩) : ৩৬।

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৭৮]

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি) বলেন,

> فَإِذَا جُعِلَ مِنْ لَوَازِمِ الإِيمَانِ أَنَّهُمْ لاَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا إِذَا كَانُوا مَعَهُ إِلاَّ بِاسْتِئْذَانِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ لاَ يَذْهَبُوا إِلَى قَوْلٍ وَلاَ مَذْهَبٍ عِلْمِيٍّ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ، وَإِذْنُهُ يُعْرَفُ بِدَلاَلَةِ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ أُذِنَ فِيهِ.
>
> ‘যখন সাহাবিগণ রাসুলের সঙ্গে থাকেন, তখন তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও না-যাওয়াকে আল্লাহ তাআলা ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ স্থির করেছেন। তাই বলাই বাহুল্য, নবিজির অনুমতি ছাড়া কোনো রায় প্রকাশ না করা বা কোনো মতানুসরণ না করা অবশ্যই ইমানের আবশ্যক অঙ্গ। নবিজি যে দীন ও দীনের উৎস নিয়ে আমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন, তার দ্বারা যদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবেই বুঝা যাবে, বিষয়টি তাঁর অনুমোদিত।’[৭৯]

এসব আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাসুলের মুখাপেক্ষী হওয়া সাহাবিগণের জন্য অপরিহার্য ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কুরআনের বিধান খুলে খুলে বলতেন। তিনি তাদের সামনে কুরআনের জটিল স্থানগুলোর সমাধান উপস্থাপন করতেন। তাদের মধ্যকার কলহ-বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। আর সাহাবিগণও নবিজির বিধি-নিষেধের সীমার ভিতরে থাকা অপরিহার্য মনে করতেন। যদি কোনো বিষয়ে তারা একান্ত নবিজির জন্য বিশেষ বিধান বলে অবগত হতেন, সেক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতেন। এ ছাড়া যেকোনো প্রকার নেক আমল, ইবাদত ও লেনদেন সর্বক্ষেত্রে তারা তাঁকেই অনুসরণ করতেন।

তাই তো তাঁর নিকট থেকেই সালাত-সম্পর্কিত বিধানাবলি, পদ্ধতি ও মৌলিক বিষয়গুলো গ্রহণ করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

---

[৭৮] সুরা আন-নুর (২৪) : ৬২।

[৭৯] ইলামুল মুওয়াক্কিইন আন রাব্বিল আলামিন : ১/৫৮।

إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.

> "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধানাবলির সীমারেখা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।"'[৮২]
>
> হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার সময়ও নবিজি রাগ হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সাথে। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা ইহরাম খোলো এবং মাথা মুণ্ডন করো।' তারা সে মুহূর্তে তা করলেন না। কারণ সন্ধি হওয়াতে তারা নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন। তখন তিনি নিজেই সবার আগে ইহরাম খুললেন। তাঁর অনুসরণে সকল সাহাবা তাড়াতাড়ি ইহরাম খুললেন।[৮৩]

নবিজিকে ধারণাতীত অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। কোনো কারণ জানা ছাড়াই তারা নবিজি যা করতেন, তা-ই করতেন। তিনি যা বর্জন করতেন, তারাও তা বর্জন করতেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করলেন। সাহাবায়ে কেরামও স্বর্ণের আংটি বানিয়ে পরিধান শুরু করে দিলেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটিটি পরা ছেড়ে দিলেন। বললেন, আমি আর কখনো তা পরিধান করব না। তারপর সাহাবায়ে কেরামও তাদের আংটি পরা ত্যাগ করলেন।'[৮৪]

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় *আশ-শিফা* গ্রন্থে আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 'একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম-সহ সালাতে রত, হঠাৎ তিনি তার জুতা মুবারক খুলে বাম পাশে রেখে দেন। তা দেখে সাহাবিগণও তাদের জুতা খুলে পাশে রেখে দিলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন জুতা খুলে পাশে রেখে দিলে? তারা বললেন, আমরা দেখলাম আপনি জুতা খুলে ফেললেন, তাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (আমি জুতা খুলেছি, কারণ) জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে জানালেন, আমার জুতাতে নাপাক কিছু রয়েছে।'[৮৫]

ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবিগণকে নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত পড়তেন,

---

[৮২] মুয়াত্তা মালিক: ৭৯৭, ইমাম মালিকের সূত্রে হাদিসটি ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় *আর-রিসালাহ* গ্রন্থে (পৃ. ৪০৪) উদ্ধৃত করেছেন, আরও দেখুন, সহিহ মুসলিম : ১১০৮।

[৮৩] সহিহ বুখারি : ২৭৩১।

[৮৪] সহিহ বুখারি : ৭২৯৮।

[৮৫] সুনানু আবি দাউদ : ৬৫০।